উপস্থিতঃ
বিচারপতি সহিদুল করিম
এবং
বিচারপতি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

ডেথ রেফারেন্স নং ৬৩/২০১৭
ফৌজদারী আপীল নং ৫৬৫১/২০১৭
এবং
জেল আপীল নং ২১১/২০১৭

রাষ্ট্র
-বনাম-

আব্দুল জলিল

জনাব বশির আহমেদ, ডেপুটি অ্যাটর্নী জেনারেল সঙ্গে
জনাব নির্মল কুমার দাস, সহকারী অ্যাটর্নী জেনারেল ও
জনাব সাইয়্যেদা শবনম মোস্তারী, সহকারী অ্যাটর্নী জেনারেল
জনাব মোঃ তারিকুল ইসলাম (হিরা), সহকারী অ্যাটর্নী জেনারেল
..... রাষ্ট্র পক্ষে।

জনাব এম. মাসুদ রানা, আইনজীবী সঙ্গে
জনাব কাজী নফিউল মাজিদ, আইনজীবী ও
জনাবা উম্মে সালমা, আইনজীবী
----- আপীলকারী আসামীর পক্ষে

শুনানীর তারিখঃ ০৫/০১/২০২৩, ১০/০১/২০২৩, ১১/০১/২০২৩, ১৮/০১/২০২৩ ও ১৯/০১/২০২৩ এবং রায়ের তারিখঃ ২৯/০১/২০২৩ খ্রিঃ।

বিচারপতি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান,

আলোচ্য ডেথ রেফারেন্সটি বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, বরগুনা কর্তৃক ০৯/০৫/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে প্রদত্ত মৃত্যুদন্ডাদেশ সংক্রান্ত রায় ও আদেশ হতে উদ্ভূত। দন্ডপ্রাপ্ত আসামী ১। আবদুল জলিল, ২। মোঃ জুয়েল, ৩। নাজমা বেগম, ৪। নয়া মিয়া, ৫। পিয়ারা বেগম ও ৬। কবির কে দন্ডবিধির ৩০২/ ২০১/ ৩৪ ধারার অধীনে অপরাধ সংঘটনের অভিযোগে বিচারের জন্য সোপর্দ করা হলে সংশ্লিষ্ট আদালত আসামী আবদুল জলিল কে দন্ডবিধির ৩০২ ও ২০১ ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত পূর্বক দায়রা মামলা নং

৩০/২০০৪ (পাথরঘাটা থানার মামলা নং ১২ তারিখ ২৩/০৮/২০০৩ ইং এবং জি আর নং ৯৮/২০০৩ পাথরঘাটা) প্রদত্ত রায় ও আদেশের মাধ্যমে যথাক্রমে মৃত্যুদন্ড সহ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকার অর্থদন্ড এবং ০৭ (সাত) বছরের সশ্রম কারাদন্ড ও ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করেন। এছাড়া অন্য আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানিত না হওয়ায় তাদেরকে নির্দোষ গন্যে বেকসুর খালাস প্রদান করেন।

অতঃপর উক্তরুপ মৃত্যুদন্ডাদেশ অনুমোদনের জন্য অতিরিক্ত দায়রা জজ, বরগুনা এর কার্যালয়ের স্মারক নং ৫১৪/অতি/ জজ/ বর তারিখ ১৭/০৫/২০১৭ খ্রিঃ মূলে মামলার যাবতীয় কার্যক্রম অত্র কোর্টে প্রেরণ করেন।

অপরদিকে মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামী আব্দুল জলিল জেল আপীল নং ২১১/২০১৭ ও ফৌজদারী আপীল নং ৫৬৫১/২০১৭ দায়ের করেন। উক্ত ডেথ রেফারেন্স এবং ফৌজদারী আপীলসহ জেল আপীলটি একই রায় হতে উদ্ধুত হওয়ায় এগুলোর শুনানী একত্রে গ্রহন করা হয়েছে এবং অত্র রায়ের মাধ্যমে বর্ণিত মামলাসমূহ নিষ্পত্তি করা হবে।

রাষ্ট্রপক্ষের মামলাটির ডিসিষ্ট মালতী বেগম দন্ডপ্রাপ্ত আসামী আব্দুল জলিলের স্ত্রী। উক্ত মালতি বেগম, আব্দুল জলিলের বসতবাড়ী বরগুনা জেলার পাথরঘাটা থানাধীন শিংড়াবুনিয়া বাইনচুটকি সাকিনে উক্ত আবদুল জলিলের সাথে একত্রে স্বামী স্ত্রী হিসাবে বসবাস করা কালে ডিসিস্ট মালতি বেগমকে গলা কেটে হত্যা করে লাশ পাটের বস্তাবন্দি করে মাটির গর্ত করে মাটি চাপা দিয়া রাখার ঘটনা হতে উদ্ভুত।

প্রসিকিউশন কেস সংক্ষেপে এই যে, এই মামলার এজাহারকারী মোঃ একরামুল হক (পি. ডব্লিউ-২০) এস, আই, কাকচিরা নৌ-পুলিশ ফাঁড়ি, থানা পাথরঘাটা, জেলা: বরগুনা গত ২৩/০৮/২০০৩ ইং তারিখ ১৮.৩০ ঘটিকার সময় পাথরঘাটা থানায় হাজির হয়ে এই মর্মে এজাহার দায়ের করেন যে, গত ১৯/০৮/২০০৩ তারিখ পাথরঘাটা থানার স্মারক নং ৬৭ মূলে অভিযোগকারীর স্বাক্ষরবিহীন দরখাস্ত এর বিষয়টি অনুসন্ধান করে

দেখার জন্য তার উপর হাওলা করা হলে তিনি সংগীয় ফোর্স সহ পাথরঘাটা থানার শিংড়াবুনিয়া (বাইনচুটকী) সাকিনে রওয়ানা হয়ে ২৩/০৮/২০০৩ তারিখ বেলা অনুমান ৯.১৫ টার সময় উক্ত গ্রামে পৌছে অভিযোগ সংক্রান্তে প্রকাশ্যে ও গোপনে তদন্ত করে প্রাথমিক সত্যতা পেলে স্থানীয় আলী আকবর মান্নান, সাবেক চেয়ারম্যান কাকচিড়া ইউপি, সাজেদা আক্তার, সংরক্ষিত মহিলা ইউপি সদস্যা কাকচিড়া ইউপি, আঃ জব্বার এডভোকেট সহ গন্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে শিংড়াবুনিয়া গ্রামের সোবহানের পোড়া বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে জনৈক নয়া মিয়া হাং এর বাগানের কান্দিতে খোঁজা খুঁজি করে কান্দির দক্ষিন মাথায় একটি স্থানে নতুন মাটি ফেলানো যার উপর একটি ছোট নতুন বাশেঁর ঝাড় লাগানো এবং মাটি উপর থেকে নীচের দিকে বসে যাওয়ার চিহ্ন পাওয়া যায়। স্থানটিতে গেলে পঁচা গন্ধ বের হতে থাকলে এতে তাদের মনে গভীর সন্দেহের সৃষ্টি হয়। বেনামী দরখাস্তটিতে আসামী আবদুল জলিল তার স্ত্রীকে খুন করে উল্লেখিত স্থানে পুতে রেখেছে মর্মে উল্লেখ থাকায় স্থানীয় হিরু গোলদার (পি. ডব্লিউ-২) ও রুস্তুম হাং (পি. ডব্লিউ-১৩) এর উপস্থিতিতে উল্লেখিত স্থানটির মাটি খুঁড়ে ৪ ফুট নীচে পাটের তৈরি একটি চট পাওয়া যায়। চটটি সরানোর পর একটি পাটের বস্তা মুঠি বাধা অবস্থায় পাওয়া যায়। বস্তাটি হিরু ও রুস্তুম এর দ্বারা উপরে তুলে বস্তার মুখ খোলার সাথে সাথে বস্তার মধ্যে একজন মহিলার লাশ পাওয়া যায়। বস্তাটি মাঝখান দিয়ে কাটার পর সম্পূর্ন লাশটি বের হয়ে যায়। ঐ স্থানে উপস্থিত নয়া মিয়া, নাজমা এবং অন্যান্য লোকজন লাশটি আসামী আবদুল জলিলের স্ত্রীর লাশ বলে সনাক্ত করে। ভিকটিমের নাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সকলেই তার নাম মালতি বেগম বলে জানায়। তিনি (পি. ডব্লিউ-২০) উপস্থিত লোকজনের সামনে উক্ত লাশের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরী কালে স্থানীয় লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারেন যে, ভিকটিমের বয়স ২৪ বছর এবং সে একজন সুন্দরী মহিলা ছিল। সুরতহাল করার সময় দেখা যায় যে, তার গলার সম্মুখ ভাগ ধারালো অস্ত্র দ্বারা জবাই করার চিহ্ন আছে। লাশটি

ওলট পালট করে দেখা কালে গলাকাটা চিহ্ন ছাড়া অন্য কোন আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। সুরতহাল প্রস্তুত শেষে লাশ ময়না তদন্তের জন্য বরগুনা মর্গে প্রেরন করেন এবং পাথরঘাটা থানায় এসে তিনি এজাহার দায়ের করেন।

পাথরাঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্ত লিখিত এজাহার পেয়ে উহা পাথরঘাটা থানার ১২ নং মামলা হিসাবে রুজ্জু করে এস, আই, মোঃ শহিদুল আলম (পি. ডব্লিউ-১৬) কে মামলার তদন্তভার অর্পন করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্তভার প্রাপ্ত হয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শনসহ ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র ও সূচিপত্র অংকনসহ সাক্ষীদের জবানবন্দি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারার বিধানমতে লিপিবদ্ধ করেন। ধৃত আসামী নয়া মিয়া, নাজমা, পিয়ারা বেগম ও আবদুল জলিলকে জিজ্ঞাসাবাদে তারা হত্যাকান্ডটি সংঘঠনে নিজেদের সম্পৃক্ত করে অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করতে স্বেচ্ছায় ইচ্ছুক হওয়ায় তাদেরকে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট, পাথরঘাটা বরাবর উপস্থাপন করা হলে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আঃ আউয়াল হাওলাদার (পি. ডব্লিউ-২১) তাদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধানমতে লিপিবদ্ধ করেন। মামলাটি প্রকাশ্য ও গোপনে তদন্ত করে আসামী ১। আবদুল জলিল, ২। মোঃ জুয়েল, ৩। নাজমা বেগম ৪। নয়া মিয়া, ৫। পিয়ারা বেগম, ৬। কবির এর বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩০২/২০১/৩৪ ধারার অপরাধ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত ধারায় পাথরাঘাটা থানার অভিযোগ পত্র নং ১০৪ তারিখ ২২/১০/২০০৩ দাখিল করেন।

অতঃপর মামলাটি বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য বিজ্ঞ দায়রা জজ আদালত, বরগুনা বরাবর প্রেরন করা হলে বিজ্ঞ দায়রা জজ বিগত ০২/১১/২০০৪ তারিখে অভিযোগপত্রে বর্ণিত আসামী ১। আঃ জলিল, ২। মোঃ জুয়েল, ৩। নাজমা বেগম ৪। নয়া মিয়া, ৫। পিয়ারা বেগম, ৬। কবির সহ আসামী ৭। মোঃ আলম, ৮। পনু মিয়া ও ৯। রুনু বেগমের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩০২/২০১/৩৪ ধারার অভিযোগ আমলে গ্রহন করেন। অত:পর গত

০৩/০৯/২০০৫ তারিখে আসামী পনু মিয়া, রুনু বেগম, এবং আলম কে দন্ডবিধির ৩০২/২০১/৩৪ ধারার অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি প্রদান করে অপর আসামী ১। আবদুল জলিল, ২। মোঃ জুয়েল, ৩। নাজমা বেগম ৪। নয়া মিয়া, ৫। পিয়ারা বেগম, ৬। কবির এদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩০২/২০১/৩৪ ধারায় অভিযোগ গঠন করে তাদের উহা পাঠ ও ব্যাখ্য করে শুনানো হলে তারা নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করে বিচার প্রার্থনা করে। অত:পর বিগত ৩১/০৭/২০০৬ ইং তারিখের ১১৯ জি নং আদেশ মোতাবেক দায়রা জজ আদালত, বরগুনা থেকে মামলাটি বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত, বরগুনা বরাবর প্রেরণ করা হয়।

পরবর্তীতে এই মামলায় ০৯ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহন শেষে ০২/০২/২০১২ তারিখে বিজ্ঞ বৈচারিক আদালতের নিকট ইহা প্রকাশিত হয় যে, গত ০৩/০৯/২০০৫ তারিখের আদেশে আসামীদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩০২/২০১/৩৪ ধারায় অপরাধ সংঘঠন করার বিষয় উল্লেখ করা হলেও গঠিত অভিযোগ বিজ্ঞ বিচারক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়নি। ফলে ০২/০২/২০১২ তারিখের ৭৭ নং আদেশে পুনরায় আসামী ১। আবদুল জলিল, ২। মোঃ জুয়েল, ৩। নাজমা বেগম ৪। নয়া মিয়া, ৫। পিয়ারা বেগম, ৬। কবির এর বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩০২/২০১/৩৪ ধারায় অভিযোগ গঠন করে তাদের উহা পাঠ ও ব্যাখ্য করে শুনানো হলে তারা নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করে বিচার প্রার্থনা করে। অত:পর অভিযোগপত্রে বর্ণিত ২৪ জন সাক্ষীর মধ্যে প্রসিকিউশন পক্ষে ২১ জন সাক্ষীকে আদালতে উপস্থাপন করে তাদের জবানবন্দি ও জেরা যথারীতি গৃহিত হয়। প্রসিকিউশন পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান সমাপ্ত হলে আসামীদেরকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারার বিধানমতে পরীক্ষা করা হলে তারা পুনরায় নিজেদের নির্দোষ দাবী করে বিচার প্রার্থনা করেন। রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের জেরার ধরন এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারার অধীন পরীক্ষাকালে আসামী পক্ষের যে বক্তব্য পাওয়া যায় তা সংক্ষেপে নিম্নরুপঃ-

আসামীগন সম্পূর্ন নির্দোষ এবং তাদেরকে মিথ্যাভাবে এই মামলায় জড়ানো হয়েছে।

অত:পর বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, বরগুনা উভয়পক্ষের যুক্তিতর্ক শ্রবণ এবং মামলায় উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমানাদি বিচার বিশ্লেষণ অন্তে আসামী আব্দুল জলিলের বিরুদ্ধে উত্থাপিত ভিকটিম মালতি বেগমকে হত্যাসহ লাশ গোপন করার অভিযোগে দন্ডবিধির ৩০২ ও ২০১ ধারায় দোষী সাব্যস্থ করে পূর্বউল্লেখিত মতে সাজা প্রদান করেন।

উল্লিখিতরুপ রায় ও আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্দ হয়ে সাজাপ্রাপ্ত আসামী আব্দুল জলিল আলোচ্য জেল আপীল ও ফৌজদারী আপীল দাখিল করেছে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, বরগুনা উক্ত আসামীকে প্রদত্ত মৃত্যুদন্ডাদেশ অনুমোদনের জন্য মামলার যাবতীয় কার্যক্রম অত্র কোর্টে প্রেরন করেছেন।

শুনানীকালে রাষ্টপক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নি জেনারেল জনাব বশির আহমেদ, বিজ্ঞ সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল সৈয়দা শবনম মোস্তারী সহকারে আলোচ্য ডেথ রেফারেন্সটি আদালতে উপস্থাপন পূর্বক নিবেদন করেন যে, রাষ্ট্রপক্ষ উপযুক্ত, গ্রহনযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য-প্রমানাদির মাধ্যমে দন্ডপ্রাপ্ত আসামীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানে সমর্থ হয়েছে।

বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নি জেনারেল এর বক্তব্য মতে মামলার ঘটনাস্থল দন্ডপ্রাপ্ত আসামী আব্দুল জলিল এর বসতবাড়ী সংলগ্ন এলাকা। এই মামলার ডিসিস্ট মালতি বেগম দন্ডপ্রাপ্ত আসামী আব্দুল জলিলের বিবাহিত স্ত্রী এবং ঘটনার পূর্বে আব্দুল জলিল ও ডিসিস্ট মালতি বেগম ঘটনাস্থলের আব্দুল জলিলের বসতঘরে একত্রে বসবাসরত অবস্থায় ছিলেন ইহা স্বীকৃত। আলোচ্য ঘটনার পরে দন্ডপ্রাপ্ত আসামী আব্দুল জলিলকে ঘটনাস্থলে পাওয়া যায়নি। ঘটনার পরে আবদুল জলিলকে ঢাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদে আব্দুল জলিল উক্ত হত্যাকান্ডে ব্যবহৃত দা খানা পুলিশের নিকট বের করে দেয়, যা

সাক্ষীদের উপস্থিতিতে জব্দ তালিকা মুলে জব্দ করা হয় এবং ০৪/০৯/২০০৩ তারিখে আসামী আবদুল জলিল নিজেকে উক্ত হত্যাকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত করে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধানমতে স্বীকারোক্তি প্রদান করেন, যা সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক যথাযথ ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নি জেনারেল শুনানীকালে আরো উল্লেখ করেন যে, যেহেতু ইহা একটি স্ত্রী হত্যা মামলা এবং যেহেতু উক্ত ডিসিস্ট মালতি বেগমের সাথে দন্ডপ্রাপ্ত আসামী আব্দুল জলিলকে উক্ত হত্যাকান্ডের পূর্ব পর্যন্ত একত্রে থাকতে দেখা দেছে, সেহেতু সাক্ষ্য আইনের ১০৬ ধারার বিধানমতে আসামী আবদুল জলিলকেই উক্ত হত্যাকান্ড সম্পর্কে ব্যাখ্য প্রদান করতে হবে। আলোচ্য মামলার ভিকটিম মালতি বেগমকে ধারালো অস্ত্র দ্বারা জবাই করে হত্যাকান্ড সম্পন্ন এবং লাশটি বস্তাবন্দি করে মাটির গর্ত করে চারফুট মাটির নিচে চাপা দিয়ে রেখে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে ঢাকায় অবস্থান রত অবস্থায় পুলিশ আবদুল জলিলকে ধৃত করে জিজ্ঞাসাবাদে তিনি উক্ত হত্যাকান্ডে ব্যবহৃত দা খানা তার নিজ দখল থেকে বের করে দেন এবং নিজেকে উক্ত হত্যাকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত করে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারার বিধান মতে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেন।

পরিশেষে, বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নি জেনারেল বলেন যে, আসামী কর্তৃক কৃত অপরাধের ভয়াবহতা ও নৃসংশতার বিষয়টি বিবেচনা পূর্বক বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, বরগুনা সঠিক ও আইনানুগ ভাবেই তর্কিত রায়ের মাধ্যমে তাকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করেছেন, যাতে হস্তক্ষেপ করার মতো আইনগত ও তথ্যগত কোন ভূল নেই উল্লেখে তিনি আলোচ্য ডেথ রেফারেন্সটি গ্রহণ পূর্বক আসামী আবদুল জলিল কর্তৃক দাখিলী জেল আপীল ও ফৌজদারী আপীল মামলাদ্বয় ডিসমিসের প্রার্থনা করেন। বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নি জেনারেল

তার বক্তব্যের সমর্থনে 4 MLR page 225, 67 DLR (AD), 54 মামলার নজির দুটি উদ্ধৃত করেন।

অপরদিকে, উপরোল্লিখ বক্তব্য খন্ডনপূর্বক আসামীপক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবি জনাব কাজী নফিউল মাজিদ বলেন যে, রাষ্ট্রপক্ষ উপযুক্ত , গ্রহনযোগ্য ও অকাট্য সাক্ষ্য প্রমানদির মাধ্যমে আসামীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানে সমর্থ হয়নি। কেননা, আলোচ্য মামলার ঘটনার কোন প্রত্যক্ষদশী সাক্ষী নেই। আলোচ্য মামলায় যে অপরাধমূলক স্বীকারোক্তিসমূহ লিপিবদ্দ করা হয়েছে, তা ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ও ৩৬৪ ধারার বিধান অনুসরন পূর্বক লিপিবদ্ধ করা হয়নি, যা অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি লিপিব্দধ করনে লিপিবদ্ধকারী সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের জন্য বাধ্যতামূলক। কিন্তু আলোচ্য মামলার ক্ষেত্রে উহা আদৌ অনুসরন করা হয়নি এবং উক্ত স্বীকারোক্তি সাদা কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উক্ত জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করার পরে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক আইন নির্ধারিত স্মারক প্রদান করা হয়নি, ফলে উক্ত স্বীকারোক্তিসমূহ আদৌ আইন কর্তৃক গ্রহনযোগ্য নয় এবং উহা আসামীর বিরুদ্ধে ব্যবহারেরও আইনগত কোন ভিত্তি নেই।

বিজ্ঞ আইনজীবি আরো দাবী করেন যে, ঘটনার অব্যবহিত পূর্বে আাসামী আব্দুল জলিল যে ঘটনাস্থলে তার বসতবাড়ীতে ডিসিস্ট মালতি বেগমের সাথে একত্রে অবস্থান করছিল, এমর্মে রাষ্ট্রপক্ষে কোন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করেনি। এছাড়া আলোচ্য হত্যাকান্ডে ব্যবহৃত কথিত দা খানা যে আসামী আব্দুল জলিল পুলিশের নিকট বের করে দিয়েছে, তদমর্মে রাষ্ট্রপক্ষে কোন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করেনি।

বিজ্ঞ আইনজীবী আরো দাবী করেন যে, বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত সম্পূর্ন অনুমানের উপর নির্ভর করে এবং রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষ্যসহ পারিপাশ্বিক সাক্ষ্য সঠিকভাবে উপলব্দি না করে সম্পূর্ন ভ্রমে পতিত হয়ে আসামীকে মৃত্যুদন্ডসহ আরো ০৭ বছরের

কারাদন্ডসহ অর্থদন্ড প্রদান করেছেন, কিন্তু উহা আদৌ সঠিক ও আইনানুগ নয় এবং জেল আপীল ও ফৌজদারী আপীলটি মঞ্জুরক্রমে আসামী আবদুল জলিলকে বেকসুর খালাসের জন্য প্রার্থনা করেন।

বিজ্ঞ আইনজীবী পরিশেষে আসামীর হাজতবাস সহ রায় ঘোষনার পর থেকে এ পর্যন্ত ফাঁসির আসামীর জন্য নির্ধারিত নির্জন কারাকক্ষে দন্ডপ্রাপ্ত আসামী আবদুল জলিল অবস্থান করার কারনে ইতোমধ্যে যে মানসিক শাস্তি পেয়েছে তা বিবেচনায় নিয়ে আসামী অপরাধী সাব্যস্থ হলে তাকে মৃত্যুদন্ডাদেশের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদানের প্রার্থনা করেন।

বিজ্ঞ আইনজীবী তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে ৩৭ ডি এল আর (এইচ সিডি) ৬৬, ৪৩ ডি. এল, আর (এডি) ২০৩, ১২ বিএলটি (এইচ সিডি) ১২৫, ৭ বি. এলসি (এইচ সিডি) ১৮০, ৬৬ ডিএলআর (এডি) ১৯৯, ২০ বিএলডি (এইচ সিডি) ৪৫, ৩৫ বিএলডি (এইচ সিডি) ৮৭ মামলার নজিরসমূহ উদ্ধৃত করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেলসহ আসামীপক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবির উপরোক্ত বক্তব্য আমরা মনোযোগ সহকারে শুনেছি এবং মামলায় উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমানাদিসহ তর্কিত রায় ও ঘটনার পারিপার্শ্বিক অবস্থাদি পুঙ্গানুপুঙ্গভাবে পর্যালোচনা করে দেখেছি।

উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিদের উত্থাপিত আলোচিত পরস্পর বিরোধী বক্তব্যসহ আলোচ্য ডেথ রেফারেন্স মামলার বিষয়ে (জেল আপীল ও ক্রিমিনাল আপীলসহ) সঠিক ও আইনানুগ সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়ার জন্য মামলায় উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমানাদিসহ সামগ্রিক ঘটনাবলী ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাদি গভীর মনোযোগ সহকারে বিচার বিশ্লেষন করা প্রয়োজন।

পি. ডব্লিউ-১ মোঃ জাকির হোসনে বাদল তার জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি ঘটনার দুই দিন আগে বরিশালে ছিলেন। বরিশাল থেকে ফিরে জানতে পারেন যে, পুলিশ তাদের এলাকায় Murder সংক্রান্ত বিষয়ে এসেছে। পুলিশ এসে কবর থেকে মালতীর (ভিকটিম) লাশ উত্তোলন করে। পুলিশ তার (পি. ডব্লিউ-১) সামনে একটি বাশের মুড়ো ঝাড় ও একটি চটের বস্তা, ১ টি রশি ও কিছু মাটি জব্দ করে। তিনি (পি. ডব্লিউ-১) জব্দ তালিকায় ২৩/০৮/২০০৩ তারিখে স্বাক্ষর করেন। পুলিশ পরবর্তী মাসে (নয়মাসে) আসামীদের ঘর থেকে একটি দা বের করে এবং জব্দ তালিকায় তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন। এই সাক্ষী জব্দ তালিকা এবং এতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন যা প্রদর্শনী- ১, ১/১ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

আসামী আবদুল জলিল এর পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী (পি. ডব্লিউ-১) বলেন যে, আজ আলামত আদালতে নাই। ২৩/০৮/২০০৩ তারিখ এর জব্দ তালিকায় তিনি তার বাড়ীতে বসে স্বাক্ষর দেন। দ্বিতীয় জব্দ তালিকায় তিনি আসামীদের বাড়ীতে বসে স্বাক্ষর দেন। দ্বিতীয় জব্দ তালিকার সময় আসামীরা ঘরে ছিল না তালাবদ্ধ ছিল। তালা আসামীদের লোক খুলিয়া দিয়েছিল। দারোগা তালা জব্দ করে নাই। জব্দ তালিকা তাকে পাঠ করে শুনিয়ে স্বাক্ষর নিয়েছিল। জব্দ তালিকায় মন্নান চেয়ারম্যান স্বাক্ষর করেছিলেন। ঘটনার সময় আসামী জুয়েল ঢাকা ছিল বলে জানেন। এই সাক্ষীকে এই মর্মে সাজেশান দেয়া হয় যে দারোগা তার সামনে কোন আলামত জব্দ করে নাই, আসামী জলিলের ঘর হতে পুলিশ দাও উদ্ধার করে নাই বা জলিলের উপস্থিতিতে প্রথম জব্দ তালিকার আলামত উদ্ধার করে নাই কিন্তু এই সাক্ষী উক্ত সাজেশান অস্বীকার করেন।

আসামী কবিরের পক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ঘটনার সময় তার জানা মতে কবির ঢাকায় ছিল।

আসামী নাজমা, নয়া মিয়া ও পিয়ারা এদের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, নয়া, নাজমা ও পিয়ারা আলাদা তবে একই বাড়ীতে বসবাস করে। পিয়ারার বয়স ৬০ বছর, নাজমা পিয়ারার অবিবাহিত মেয়ে।

পি. ডব্লিউ-২ মোঃ হিরো গোলদার @ হিরু তার জবানবন্দীতে বলেন যে, ঘটনা ২৩/০৮/২০০৩ ইং তারিখের। ঐ দিন তার (পি. ডব্লিউ-২) সামনে জলিলের বৌ (ভিকটিম) এর লাশের সুরতহাল করে। সুরতহালের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। এই সাক্ষী উক্ত সুরতহাল প্রতিবেদন এবং এতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন যা প্রদর্শনী-২, ২/১হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

আসামী জুয়েলের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি আসামী জুয়েলকে চিনেন, সে ঢাকায় কাজকর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করে।

আসামী আবদুল জলিলের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, কবর থেকে লাশ তোলার সময় পুলিশ ও স্থানীয় লোক রুস্তুম সহ তিনি (পি. ডব্লিউ-২) ছিলেন। সেই সময় আসামী জলিল ঢাকায় ছিল বলে মনে হয়। ঘটনার দিন আসামীকে পুলিশ খুঁজেছিল কিনা তার জানা নাই।

আসামী কবিরের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী (পি. ডব্লিউ-২) বলেন যে, আসামী কবির দীর্ঘ দিন আলাদা ঘরে বসবাস করে। তবে সে চাইনিজে কাজ করে কিনা জানেন না।

আসামী নয়া, পেয়ারা ও নাজমার পক্ষে এই সাক্ষীকে এই মর্মে সাজেশান দেয়া হয় যে, নয়া ও জলিল পৃথক অন্নে বাস করে কিন্তু এই সাক্ষী উক্ত সাজেশান অস্বীকার করেন।

পি.ডব্লিউ-৩ মোঃ জালাল তার জবানবন্দীতে বলেন যে, আসামী জলিল, কবির, নয়া মিয়া গং ডকে আছে। ঘটনার তারিখ বলতে পারবেন না। শনিবার দুপুরে ভাত খেয়ে বের হলে পুলিশ এসে তাকে নিয়ে চেয়ারম্যানের বাড়ীতে যেতে বলে। তিনি চেয়ারম্যানের

বাড়ী দেখিয়ে দিয়ে চলে আসেন। ঘটনা সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না। নিহত মালতী আসামী জলিলের স্ত্রী। শুনেছেন তার (মালতি) লাশ পুলিশ নিয়ে গেছে। কি ভাবে সে মারা গেছে তা বলতে পারবেন না। শুনেছেন বস্তা ভরা লাশ ছাড়াবাড়ী হতে তুলেছে।

আসামী আবদুল জলিলের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, জলিলকে যখন আটক করে তখন তিনি (পি. ডব্লিউ-৩) এলাকায় ছিলেন। ঢাকা থেকে তাকে (জলিল) আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

আসামী নয়া, পেয়ারা ও নাজমার পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, মামলার আসামীদের চিনেন। এই আসামীরা ভাল লোক। নাজমা, নয়া ও পিয়ারা তিন বাড়ীতে থাকে। তাদের পুলিশ ধরে মারধর করেছে শুনেছেন, তিনি নিজে কিছু দেখেন নাই। এই তিন আসামী নির্দোষ তা জানতে পেরেছেন।

আসামী জুয়েলের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, এই আসামী ঢাকায় চাকুরী করে। ঘটনার সময় সে (জুয়েল) ঢাকায় ছিল।

আসামী কবিরের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, কবিরের বাড়ী থেকে আসামী জলিলের বাড়ী আধা মাইলের বেশী দুরে এবং সে প্রায় ৩০ বছর যাবৎ আলাদা থাকে এবং সে (কবির) ভাল লোক।

পি.ডব্লিউ-৪ মতিয়ার রহমান তার জবানবন্দীতে বলেন যে, আসামী নয়া মিয়া, কবির, জলিল ডকে আছে। বাকীদের নাম জানেন না। ডকে যারা আছে সকলকে চেনেন তবে নাম জানেন না। ঘটনার তারিখ বলতে পারবেন না। ২/৩ বৎসর আগের ঘটনা। নিহত এর নাম জানেন না। ভিকটিমের বাড়ী থেকে তার (পি. ডব্লিউ-৪) বাড়ী এক/ দেড় মাইল দূরে। ঘটনার দিন তিনি (পি. ডব্লিউ-৪) বরগুনায় ছিলেন। বাড়ী থেকে চেয়ারম্যান বলেন খুনের সাক্ষ্য দিতে হবে। পুলিশ এলাকা থেকে অনেক টাকা নিয়েছে। পুলিশ জব্দ তালিকায় তার (পি. ডব্লিউ-৪) সই নেয়।

এই সাক্ষী তার জেরায় বলেন যে, সাদা কাগজে তার সই নেয়। কি জব্দ করে বলতে পারবেন না। খুনের ব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না।

পি.ডব্লিউ-৫ মোঃ হালিম তার জবানবন্দীতে বলেন যে, এই মামলার আসামীরা হল কবির, জুয়েল, নয়া মিয়া, জলিল, নাজমা ও পেয়ারা বেগম। এই আসামীরা অদ্য ডকে হাজির আছে। এই মামলার ঘটনা ৪/৫ বৎসর পূর্বে ঘটেছে। তিনি (পি. ডব্লিউ-৫) বাড়ীতে এসে শুনেন এবং পুলিশ এসে তাকে (পি. ডব্লিউ-৫) বলে যে নারী নির্যাতনের মামলায় তিনি সাক্ষী আছেন। ঘটনা সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না।

এই সাক্ষীকে প্রসিকিউশন পক্ষে বৈরী ঘোষনা করে জেরা করা হলে জেরায় তিনি বলেন যে, আবদুল জলিল মালতিকে ঢাকা থেকে বিয়ে করে এনেছিল কিনা এবং মালতি সুন্দরী ছিল কিনা তিনি জানেন না। মালতীর বাবা মার বাড়ী ভিন্ন জেলায় বলে আজও তারা এই খুন সম্পর্কে জানেন কিনা জানেন না।

এই সাক্ষীকে এই মর্মে সাজেশান দেয়া হয যে, নয়া মিয়ার পুত্র জলিলের স্ত্রী মালতিকে এই আসামীরা খুন করে তার লাশ ছোবহানের ছাড়াবাড়ীর কান্দিতে বস্তাভর্তি করে পুতে রেখেছে, মালতির দ্বারা জলিল দেহ ব্যবসা করানোর চেষ্টা করেছিল, মালতি দেহ ব্যবসায় রাজী না হওয়ায় এই আসামীরা যোগসাজশে মালতিকে হত্যা করে বস্তায় ভরে মাটিতে পুতে রেখেছিল, আসামীদের দ্বারা তিনি অন্যায় ভাবে লাভবান হয়ে আসামীদের বাঁচানোর উদ্ধেশ্যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন কিন্তু এই সাক্ষী এই সাজেশান অস্বীকার করেন।

আসামী জুয়েলের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, মালতী যে মারা গেছে তার বহু পূর্বে জুয়েল ঢাকা ছিল কিনা তিনি জানেন না।

আসামী কবিরের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, কবির জলিলের ভাই। তার বাড়ী জলিলের বাড়ী থেকে ১ মাইল দূরে। ঘটনার বহু পূর্ব থেকে ঢাকায় (কবির) চাইনিজ রেষ্টুরেন্টে কর্মরত ছিল।

আসামী নয়া, নাজমা ও পিয়ারার পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, নয়া কবিরের বাবা, পেয়ারা কবিরের মা, নাজমা কবিরের বোন। জলিল একা ভিন্ন ভিটায় তার স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করত। নয়া, নাজমা ও পেয়ারা নয়া মিয়ার মূল বাড়ীতে বসবাস করতো। নয়া, পিয়ারা ও নাজমাকে তিনি মারতে দেখেন নাই, শুনেছেন। তিনি বাড়ী এসে শুনেছেন পুলিশ বাধ্য করে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দি নিয়েছে।

আসামী আবদুল জলিলের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, মালতীকে তিনি কোন দিন দেখেন নাই। তিনি এলাকায় এসে শুনেছেন মালতী জলিলের স্ত্রী ছিল। জলিলের জায়গা জমি নিয়ে শত্রুতা আছে। এরা একটু ভাল আছে এবং আর্থিক স্বচ্ছল আছে। সে জন্য আশেপাশের লোকজন তাদের দেখতে পারে না। এলাকায় এসে শুনেছেন পুলিশ জলিলকে মারপিট করার ফলে সে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জবানবন্দি দিয়েছে। এলাকায় এদের সুনাম আছে।

পি.ডব্লিউ-৬ আবুল হোসেন তার জবানবন্দীতে বলেন যে, এই মামলার আসামী নয়া মিয়া, কবির, জুয়েল, জলিল ও মহিলাদের চিনেন তবে তাদের নাম জানেন না। ঘটনার তারিখ অনুমান ৪/৫ বছর পূর্বে। ঘটনার দিন তিনি (পি. ডব্লিউ-৬) বাড়ী ছিলেন না। ৬/৭ দিন পর তিনি বাড়ী এসে শুনেন জলিলের বউ মালতী সুন্দরী খুন হয়েছে। কে খুন করেছে জানেন না।

প্রসিকিউশ পক্ষে এই স্বাক্ষীকে বৈরী ঘোষনা করে এই মর্মে সাজেশান দেয়া হয় যে, জলিল তাকে (ভিকটিম) প্রায়ই মারপিট করত এবং গত ২৪/০৭/২০০৩ ইং তারিখ রাত ১২.০০ টার সময় জলিলের স্ত্রীকে এই আসামীরা খারাপ কাজ করতে চেষ্টা করে

তাতে জলিলের স্ত্রী রাজী না হওয়ায় ঘটনার তারিখ জলিলের স্ত্রীকে আসামীরা খুন করে বস্তায় ভরে ৪ ফিট মাটির নীচে রেখে সেই মাটির উপর দিয়া গাছ লাগিয়েছে এবং ইহা জেনে শুনে তিনি আসামীদের বাঁচানোর জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন কিন্তু এই সাক্ষী উক্ত সাজেশান অস্বীকার করেন।

আসামী জুয়েল ও কবিরের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, এই আসামীদেরকে তিনি এলাকার লোক হিসেবে চিনেন। গ্রামে শত্রুতার জন্য পুলিশের নিকট এই মামলা দিয়েছে বলে কানা ঘুষা হচ্ছে।

আসামী পেয়ারা, নাজমা ও নয়া মিয়ার পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, পেয়ারা, নাজমা ও নয়া মিয়া ভিন্ন বাড়ীতে থাকে। এই ঘটনার পরে পেয়ারা, নাজমা ও নয়া মিয়াকে গ্রেফতার করে। এদের পুলিশ ধরে মারধোর করে স্বীকারোক্তি নেয়া হয়েছে।

আসামী আবদুল জলিলের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, জলিলকে পুলিশ মারপিট করে স্বীকারোক্তি নিয়েছে। চেয়ারম্যানের সাথে জলিলের শত্রুতা ছিল।

পি.ডব্লিউ-৭ আশ্রাব আলী তার জবানবন্দীতে বলেন যে, নিহত মালতী বেগম জলিলের স্ত্রী ছিল। মালতীকে জলিল ঢাকা বসে বিয়ে করে। অনুমান ৬/৭ বছর পূর্বে মালতী (ভিকটিম) খুন হয়েছে।

প্রসিকিউশন পক্ষে এই সাক্ষীকে রৈরী ঘোষনা করে জেরা করা হলে তিনি বলেন যে, মালতীর বাবার বাড়ী ফরিদপুর কিনা জানেন না।

এই সাক্ষীকে এই মর্মে সাজেশান দেয়া হয় যে, মালতীকে বিয়ে করে জলিল তাকে দিয়ে অবৈধ কাজ করানোর চেষ্টা করে, জলিল মালতীকে তার নিজ গ্রামে নিয়ে আসে এবং জলিলের বাবা, মা, ভাই, বোন সবাই মালতীর সাথে খারাপ ব্যবহার করে, জলিল মালতীকে দিয়া অসামাজিক কাজ করাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ায় আসামীরা

মালতীকে খুন করে মাটিতে পুতে রাখে, তাঁর সামনে থেকে জলিল মালতীকে খুন করার উদ্দেশ্যে দা নিয়ে যায় কিন্তু এই সাক্ষী উক্ত সাজেশান অস্বীকার করেন।

আসামী নয়া মিয়া, নাজমা, কবির, জুয়েল ও পেয়ারা এদের পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয় নাই।

আসামী আবদুল জলিলের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ঘটনার সময় জলিল ঢাকায় ছিল।

পি.ডব্লিউ-৮ মোঃ চাঁন মিয়া তার জবানবন্দীতে বলেন যে, এই মামলার আসামী জলিল, নয়া মিয়া, জলিলের মা, জলিলের বোন এবং জলিলের ভাই, এদেরকে চেনেন। তারা ডকে আছে। জলিলের স্ত্রী মালতীকে চেনেন না। ঘটনার সময় তিনি (পি. ডব্লিউ-৮) বাড়ী ছিলেন না। ঘটনার পর বাড়ীতে এসে শুনেন যে জলিলের স্ত্রী মালতী খুন হয়েছে। শুনেছেন পুলিশ জলিলের স্ত্রীর লাশ নিয়ে যায় এবং জলিলকে ধরতে পারে নাই। পরে শুনেছেন পুলিশ জলিলকে ঢাকা থেকে ধরে এনেছে।

আসামী জুয়েলের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, জুয়েলকে তিনি চিনেন। ঘটনার দিন শুনেছেন জুয়েল আর কবির ঢাকায় ছিল।

আসামী কবিরের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, বহু বছর পুর্ব থেকে আলাদা বাড়ীতে স্ত্রী, মা বসবাস করে। সে (কবির) দীর্ঘদিন যাবৎ ঢাকায় শ্রমিকের কাজ করে।

আসামী নয়া মিয়া, নাজমা ও পিয়ারার পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি ঘটনার সময় বাড়ীতে ছিলেন না। পরে শুনেছেন নাজমা, নয়া মিয়া ও পিয়ারাকে পুলিশ মারপিট করেছে। নাজমা, নয়া ও পিয়ারা বেগম ভিন্ন বাড়ীতে বসবাস করে।

আসামী আবদুল জলিলের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আসামী জলিল ঘটনার দিন বাড়ী ছিল না শুনেছেন। সে এই হত্যায় জড়িত কিনা তিনি জানেন না।

পি.ডব্লিউ-৯ ডাঃ এম এ মান্নান তার জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি বরগুনা জেনারেল হাসপাতালে মেডিকেল অফিসার পদে কর্মরত থাকা অবস্থায় ২৪/০৮/২০০৩ ইং তারিখে তিনি ও আরো ৩ জন ডাক্তারের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল বোর্ডের মাধ্যমে পাথরঘাটা থানাধীন কাকচিড়া নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ২৩/০৮/২০০৩ ইং তারিখের ৫২২ স্মারক সাধারন ডায়েরীর সূত্রে মৃত মালতী বেগমের মৃতদেহের ময়না তদন্ত সম্পন্ন করেছিলেন। মৃতকালীন ভিকটিম মালতী বেগমের বয়স ছিল অনুমান ২৪ বছর। ময়না তদন্তকালে ভিকটিম মালতীর মৃতদেহে নিম্নোক্ত জখম ও বিষয়গুলি পাওয়া যায় ঃ-

(1) One cut throat wound cutting from cervical muscle of the neck round the whole throat cutting all the skin, trachea, esophagus upto the cervical vertibra bone with cutting cervical vertibra bone, On dissection cutting all the stracture of throat was found.

In our opinion:- the death was due to massive haemorrhage &shock as a result of above mentioned injury which was antemortem & homicidal in nature.

তারা (পি. ডব্লিউ-৯) ময়না তদন্তকারী ডাক্তারগণ সে মর্মে ময়না তদন্তের প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। এই সাক্ষী উক্ত ময়না তদন্ত প্রতিবেদন এবং এতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন যা প্রদর্শনী- ১৩ ও ১৩/১ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

আসামী পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ভিকটিমের গলায় প্রাপ্ত জখমটি তার মৃত্যুর আগের না পরের তা ময়না তদন্তকালে নির্নয় করা হয়নি।

এই সাক্ষীকে এই মর্মে সাজেশান দেয়া হয় যে, ভিকটিমের ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন সুষ্ট নয় কিন্তু এই সাক্ষী উক্ত সাজেশান অস্বীকার করেছেন।

পি.ডব্লিউ-১০ শাহা আলম খাঁ তার জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি এই মামলার বিষয় কিছুই জানেন না।

আসামীপক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি.ডব্লিউ-১১ খাদিজা বেগম তার জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি এই মামলার ঘটনার বিষয় কিছুই জানেন না।

প্রসিকিউশন পক্ষে এই স্বাক্ষীকে বৈরী ঘোষনা করে এই মর্মে সাজেশান দেয়া হয় যে, ভিকটিম মালতীর হত্যাকান্ডের ঘটনার অনুমান ২৩/২৪ দিন পরে আসামী কবিরের কন্যা চম্পা তাকে (পি. ডব্লিউ-১১) বলেছিল যে, তার চাচা আসামী জলিল মালতী বেগমকে হত্যা করেছে, তিনি আসামীদের দ্বারা বাধ্য হয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করেছেন কিন্তু এই সাক্ষী উক্ত সাজেশান অস্বীকার করেছেন।

পি.ডব্লিউ-১২ মোঃ জামাল মিয়া তার জবানবন্দীতে বলেন যে, ২০০৩ সালের ঘটনা। তিনি (পি. ডব্লিউ-১২) ঢাকা মেট্রো-চ-৪৩১৫ নং বাসের কনডাকটর ছিলেন। কাটাখালীর একটা মেয়ে মার্ডার হয়েছে শুনে দেখতে যান। গিয়ে মেয়েটার লাশ দেখতে পান। পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল।

প্রসিকিউশন পক্ষে এই সাক্ষী বৈরী ঘোষনা করে জেরা করা হলে তিনি (পি. ডব্লিউ-১২) জেরায় বলেন যে, আসামী জলিল তার গাড়ীতে চলাফেরা করতো একথা ঠিক। সে (আসামী জলিল) একটা বাংলা দা নিয়ে ঘটনার দেড় মাস আগে তার (পি. ডব্লিউ-১২) গাড়ীতে ওঠে এবং বাস ড্রাইভারের সাথে ঝগড়া করেছিল একথা ঠিক। ঐ দা পরে জলিলের কাছ থেকে উদ্ধার হয় কিনা জানেন না।

এই সাক্ষীকে এই মর্মে সাজেশান দেয়া হয় যে, তিনি পুলিশের কাছে দা খানা সনাক্ত করেছিলেন কিন্তু এই সাক্ষী উক্ত সাজেশান অস্বীকার করেন।

আসামী আবদুল জলিলের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ভাড়া নিয়ে ড্রাইভারের সাথে জলিলের সাথে গোলমাল হয়েছিল। জলিল দা নিয়ে উঠে ছিল কিনা জানেন না। ব্যাগে কি ছিল জানেন না। তিনি (পি. ডব্লিউ-১২) জলিলের হাতে কোন দা দেখেননি।

আসামী জুয়েলের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, ঘটনার আগে থেকে জুয়েল ঢাকা থাকত। ঘটনার সময় সে (জুয়েল) ঢাকায় ছিল।

বাকী আসামীদের পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি.ডব্লিউ-১৩ মোঃ রুস্তুম আলী মাঝি তার জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি ঘটনার সময় কাকচিড়া বাজারে নাইট গার্ড ছিলেন। কাকচিড়া নৌ ফাড়ির পুলিশ তাকে নিয়ে শিংড়াবুনিয়া গ্রামে যায়। পুলিশ তাকে (পি. ডব্লিউ-১৩) নিয়ে লাশ খোঁজাখুঁজি করতে থাকাকালে বাশের ঝাড়ে মাটি ডাবানো দেখে তিনি ও সেলিম কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে কেরোশিনের গন্ধ পান। আরো ছালানোর পরে পাটের একটি বস্তা দেখতে পান। বস্তার মুখ খুলে একজন মহিলার লাশ দেখতে পান, তার গলা কাটা ছিল। লাশ দেখে স্থানীয় সকলে তাকে (ভিকটিম) আবদুল জলিলের স্ত্রীর লাশ বলে সনাক্ত করে।

আসামীদের পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি.ডব্লিউ-১৪ মিসেস রুনু বেগম তার জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি আসামীদেরকে চিনেন। জলিল, জুয়েল, পিয়ারা ও নাজমা বেগম আসামী। নিহত মালতী সুন্দরীকে চিনতেন না। তিনি মামলার ঘটনার বিষয়ে কিছু জানেন না। তিনি বাড়ী ছিলেন না। বস্তু প্রদর্শনী-১ হিসেবে চিহ্নিত চিঠিটা তার হাতের লেখা নয়। তিনি লেখা পড়া জানেন না। কোন মতে স্বাক্ষর করতে পারেন।

প্রসিকিউশন পক্ষে এই স্বাক্ষীকে বৈরী ঘোষনা করে তাকে জেরা করা হলে তিনি বলেন যে, ১ নং আসামী জলিল তার দেবর। নিহত মালতী সুন্দরী জলিলের স্ত্রী তথা তার (পি. ডব্লিউ-১৪) জাঁ।

প্রসিকিউশন পক্ষে এই সাক্ষীকে এই মর্মে সাজেশান দেয়া হয় যে, আসামীরা মালতী সুন্দরীকে খুন করেছে যা তিনি ননদ নাজমার কাছে শুনেছেন এবং হত্যার ঘটনার বর্ননা দিয়ে আই, ও, সহিদুল ইসলামকে চিঠি দিয়েছেন, ৩০/০৮/২০০৩ তারিখের এই চিঠিটা তার হাতের লেখা এবং তাতে এই স্বাক্ষর তার এবং স্বামী, দেবর, শ্বশুর , ননদদের বাচানের জন্য সত্য গোপন করে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন কিন্তু এই সাক্ষী উক্ত সাজেশান অস্বীকার করেন।

আসামী নয়া মিয়া, নাজমা ও পিয়ারার পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি শুনেছেন যে, পুলিশ এসে নয়া মিয়া, নাজমা ও পিয়ারাকে মারধর করে দোষ স্বীকার করানোর জন্য চাপ সৃষ্টি করেছে।

আসামী আবদুল জলিলের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আসামী জলিল সহ অন্যান্য আসামীরা ঘটনার আগে থেকে ঢাকায় থাকতো।

আসামী জুয়েল ও কবিরের পক্ষে উপরোক্ত জেরা Adopt করা হয়।

পি.ডব্লিউ-১৫ কং ৪৫৬ আঃ মান্নান তার জবানবন্দীতে বলেন যে, এস, আই আকরামুল সাহেবের (পি. ডব্লিউ-২০) সাথে ২৩/০৮/২০০৩ তারিখে কাকচিড়া ফাঁড়িতে কর্মরত থাকাকালে কং আলতাফ ও নায়েক এনায়েতের সাথে তিনি নয়ামিয়ার ছাড়াবাড়িতে যান। বাড়ীর বাগানের মধ্যে নতুন মাটি কাটা দেখে ও গন্ধ পেয়ে তাদের সন্দেহ হলে মাটি খুড়ে একজন মহিলার লাশ পাওয়া যায়। পরে জানা যায় যে, মহিলার নাম মালতী। তার (ভিকটিম) শ্বশুর ও শ্বাশুড়ী তার (মালতি) লাশ শনাক্ত করে। মালতীর স্বামী আসামী আব্দুল

জলিল। সেখানে সুরতহাল করা হয়। তিনি (পি. ডব্লিউ-১৫) ও কং আলতাফ লাশ মর্গে নিয়ে আসেন। ময়না তদন্ত শেষে লাশ তার (ভিকটিম) চাচা শ্বশুরের কাছে হস্তান্তর করেন।

আসামী পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি.ডব্লিউ-১৬ মোঃ শহিদুর ইসলাম তার জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি গত ২৩/০৮/২০০৩ ইং তারিখে পাথরঘাটা থানায় এস, আই, পদে কর্মরত থাকাকালে এজাহারকারীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে FIR দায়ের হলে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তার (পি. ডব্লিউ-১৬) উপর তদন্তভার অর্পন করেন। তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ঘটনাস্থলের খসড়া মানচিত্র ও সূচীপত্র অংকন করেন। আলামত জব্দ করেন। এজাহারকারী ও সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের জবানবন্দি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারা অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করেন। আসামী আব্দুর রহিমকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করেন। আসামীদের ১৬৪ ধারার জবানবন্দি রেকর্ড করার জন্য দরখাস্ত করেন এবং উক্ত জবানবন্দি সংগ্রহ করে পর্যালোচনা করেন। তার (পি. ডব্লিউ-১৬) তদন্ত ও সাক্ষ্য প্রমানে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হলে তাদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩০২/২০১/৩৪ ধারায় পাথরঘাটা থানার অভিযোগ পত্র নং ১০৪ তারিখ ২২/১০/২০০৩ ও দন্ডবিধির ৩০২/২০১/৩৪ ধারায় অভিযোগপত্র দাখিল করেন। এছাড়া আসামী পনু মিয়া এবং রুনু বেগমকে এই মামলার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দানের জন্য আবেদন করেন।

এই স্বাক্ষী অভিযোগপত্র, সূচীপত্র ও খসড়া মানচিত্র এবং এতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন যা যথাক্রমে প্রদর্শনী ৪, ৪/১, ৫, ৫/১, ৬, ৬/১ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

আসামী কবিরের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী (পি. ডব্লিউ-১৬) বলেন যে, আসামী কবির আসামী জলিলের বড় ভাই এবং সে জলিলের বাড়ী থেকে আধা মাইল দূরে পৃথক বাড়ীতে বসবাস করে। ১৬৪ ধারার জবানবন্দিতে আসামী কবিরের নাম নেই। এই

সাক্ষীকে এই মর্মে সাজেশান দেয়া হয় যে, ঘটনার আগ থেকে এবং ঘটনার সময়ে আসামী কবির ঢাকায় বসবাস করে, তিনি (পি. ডব্লিউ-১৬) আসামীর শত্রু পক্ষ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কবিরকে অত্র মামলায় জড়িত করে মিথ্যা অভিযোগ পত্র দাখিল করেছেন কিন্ত এই সাক্ষী উক্ত সাজেশান অস্বীকার করেন।

আসামী জুয়েলের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী (পি. ডব্লিউ-১৬) বলেন যে, আসামী জুয়েলের নাম ১৬৪ ধারার জবানবন্দিতে নেই। ঘটনার সময় সে ঢাকায় পড়াশুনা করতো।

আসামী আবদুল জলিলের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী (পি. ডব্লিউ-১৬) বলেন যে, আসামী জলিলকে তিনি ঢাকা থেকে গ্রেফতার করেন। সে (জলিল) ঘটনার আগে ঢাকায় থাকতো তবে ঘটনার সময় বাড়ীতে ছিলো।

এই সাক্ষীকে এই মর্মে সাজেশান দেয়া হয় যে, আসামী জলিল ঘটনার সময় বাড়ীতে ছিল না, আসামী জলিলকে নির্যাতন করে ১৬৪ ধারার জবানবন্দি আদায় করা হয়েছে, আসামী জলিল সম্পূর্ন নির্দোষ, তিনি মিথ্যা অভিযোগপত্র দিয়েছেন কিন্ত এই সাক্ষী উক্ত সাজেশান অস্বীকার করেন।

আসামী নয়া মিঞা, পিয়ারা ও নাজমার পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী (পি. ডব্লিউ-১৬) বলেন যে, আসামী নয়া, পিয়ারা এবং নাজমাকে তিনি গ্রেফতার করেন। তারা একই ঘরে থাকে। আসামী জলিল ভিন্ন খায়, ভিন্ন থাকে।

এই সাক্ষীকে এই মর্মে সাজেশান দেয়া হয় যে, তিনি এই আসামীদের চাপ প্রয়োগ করে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি করতে বাধ্য করেছেন, তিনি আসামী নয়া মিয়া, পিয়ারা এবং নাজমা এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ না পাওয়া সত্ত্বে অভিযোগ পত্র দাখিল করেছেন কিন্ত এই সাক্ষী উক্ত সাজেশান অস্বীকার করেছেন।

পি.ডব্লিউ-১৭ মোঃ আব্দুস ছালাম তার জবানবন্দীতে বলেন যে, ঘটনার তারিখ ২৪/০৭/২০০৩, তিনি তখন ঢাকায় ছিলেন। ঘটনা শুনে বাড়ীতে আসলে মান্নান চেয়ারম্যান

তাকে থানায় নিয়ে যায়। তখন থানায় দারোগা তার স্বাক্ষর নেয়। তিনি এর বেশী কিছু জানেন না।

প্রসিকিউশন পক্ষে এই সাক্ষীকে বৈরী ঘোষনা করে এই মর্মে সাজেশান দেয়া হয় যে, তিনি আসামী পক্ষে বাধ্য হয়ে রাষ্ট্রপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন কিন্তু এই সাক্ষী উক্ত সাজেশান অস্বীকার করেন।

আসামীপক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয়নি।

পি.ডব্লিউ-১৮ মোসাম্মৎ সাজেদা আক্তার তার জবানবন্দীতে বলেন যে, মামলার ঘটনার সময় তিনি ঘটনাস্থলের এলাকার নির্বাচিত ইউপি সদস্য ছিলেন। তিনি তখন ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে ছিলেন। তার সামনে পুলিশ সুরতহাল রিপোর্ট তৈরী করে এবং তিনি তাতে স্বাক্ষর করেন। এই সাক্ষী উক্ত সুরতহাল প্রতিবেদন এবং এতে তার সনাক্ত করেন যা প্রদর্শনী- ২/২ চিহ্নিত হয়েছে।

আসামী পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি এখনও সংশ্লিষ্ট এলাকার মহিলা সদস্য (নির্বাচিত)। আসামী নয়া মিয়া, পিয়ারা এবং নাজমা তার ওয়ার্ডের ভোটার। তিনি তাদের চিনেন। তারা ভিন্ন বাড়ীতে থাকে। তিনি শুনেছেন পুলিশ তাদেরকে মারধর করেছে।

পি.ডব্লিউ-১৯ সোহাগী কে রাস্ট্রপক্ষে টেন্ডার ঘোষনা করা হলে আসামী পক্ষে এই সাক্ষীকে জেরা করা হয় নাই।

পি.ডব্লিউ-২০ একরামুল হক তার জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি গত ২৩/০৮/২০০৩ ইং পাথরঘাটা থানাধীন কাকচিরা নৌ-পুলিশ ফাঁড়িতে কর্মরত ছিলেন। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাকে (পি. ডব্লিউ-২০) স্বাক্ষরবিহীন অভিযোগপত্র ও তদন্তের ভার অর্পন করলে তিনি উক্ত অভিযোগ পেয়ে কাকচিরা পুলিশ ফাঁড়ির জিডি নং ৫২২ তারিখ ২৩/০৮/২০০৩ মুলে সঙ্গীয় ফোর্স সহ তদন্তের জন্য সিংরাবুনিয়া গ্রামে উপস্থিত হন। স্থানীয় সাবেক ইউ, পি চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান এবং মহিলা সদস্য সাজেদা (পি.

ডব্লিউ-১৮) ও অন্যান্য লোকজন সহ ঘটনাস্থলে যান। মোঃ আবদুস সোবাহানের বাড়ীর পূর্ব পাশে নয়া মিয়া হাওলাদার এর বাগানের কান্দি। এক পর্যায়ে কান্দির দক্ষিন মাথায় নতুন মাটি ফেলানো দেখেন এবং নতুন বাশের ঝাড় লাগানো অবস্থায় পান। সেখান থেকে পচা দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। সন্দেহ হওয়ায় স্থানীয় হিরু (পি. ডব্লিউ-২) ও রুস্তুম (পি. ডব্লিউ-১৩) দ্বারা মাটি খুড়তে থাকেন। অনুমান ৪ ফিট মাটির নীচে একটা পাটের চট দেখতে পান। চটের নীচে মুখ বাধা অবস্থায় একটা চটের বস্তা দেখেন। উক্ত বস্তা উত্তোলন করে বস্তা কেটে একজন মহিলার লাশ দেখতে পান। স্থানীয় লোকজন উক্ত মহিলাকে মালতী বেগম, জলিলের স্ত্রী বলে জানায়। তিনি (পি. ডব্লিউ-২০) উক্ত লাশের সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত করে লাশ ময়না তদন্তের জন্য প্রেরন করেন। সুরতহাল রিপোর্টে গলার সম্মুখে ভাগে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাটা দেখতে পান। লাশের শরীরে পচন ধরলেও চুল সতেজ ছিল। লাশের শরীরে আর কোন আঘাতের চিহ্ন পাননি। তিনি ঘটনাস্থলে সুরতহাল রিপোর্ট এবং জব্দ তালিকা প্রস্তুত করেন। তিনি পরবর্তীতে পাথরঘাটা থানায় গিয়ে এজাহার দায়ের করেন। ঘটনাস্থলে শুনেছেন জলিল (ভিকটিমের স্বামী) ঢাকায় বসবাসরত ফরিদপুর নিবাসী মালতী বেগমকে (ভিকটিম) বিবাহ করে। আঃ জলিল স্ত্রীকে অসামাজিক কাজে নিয়োজিত করে টাকা পয়সা আয় করে, নিজে কোন কাজ করে না। মৃত মালতী বেগমের গর্ভজাত একটা সন্তান আছে। মৃত মালতী বেগমকে অসামাজিক / অনৈতিক কাজে নিয়োজিত করতে ব্যর্থ হয়ে তাকে ঘটনাস্থলের বাড়ীতে নিয়ে আসে এবং পূর্ব পরিকল্পিতভাবে তাকে খুন করে লাশ গুম করে আসামীরা দন্ডবিধির ৩০২/২০১/৩৪ ধারার অপরাধ সংঘটন করেছে। তিনি নিজ হাতে FIR লিখে তাতে স্বাক্ষর করে দাখিল করেছেন।

এই স্বাক্ষী সুরতহাল প্রতিবেদন, জব্দ তালিকা, এজাহার এবং এতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন, যা যথাক্রমে ২/৩, ১/২, ৭, ৭/১ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

আসামী কবিরের পক্ষে জেরায় এই স্বাক্ষী বলেন যে, তিনি ২২/০৮/২০০৩ ইং তারিখে অভিযোগ পান। খুনের পরিকল্পনা কোথায় হয় সে সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত জ্ঞান নাই। আসামী কবির আলাদা বাড়িতে থাকে কিনা তা তিনি জানেন না। মৃত মালতীকে কে বা কারা, কোথায় বসে কখন খুন করে সে সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত জ্ঞান নাই

আসামী জুয়েলের পক্ষের জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আসামী জুয়েল বাড়িতে থাকে কিনা তিনি জানেন না, তবে সে ঘটনার সাথে জড়িত।

আসামী নয়া, নাজমা, পিয়ারার পক্ষে উপরোক্ত জেরা গ্রহন করে এই মর্মে সাজেশান দেয়া হয় যে, নয়া, নাজমা ও পিয়ারা ঘটনার আগ থেকে ভিন্ন বাড়ীতে থাকে, নয়া ও তার স্ত্রী এবং কন্যার সাথে ইউপি চেয়ারম্যানের বিরোধ, তিনি (পি. ডব্লিউ-২০) উদ্দেশ্য প্রনোদিত হয়ে উল্লিখিত আসামীদের অত্র মামলায় জড়িয়েছেন কিন্তু এই সাক্ষী উক্ত সাজেশান অস্বীকার করেছেন।

আসামী আবদুল জলিলের পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, আসামী জলিল ঢাকায় থাকে। এই সাক্ষীকে এই মর্মে সাজেশান দেয়া হয় যে, ঘটনার সময় আসামী জলিল ঢাকায় ছিল, তিনি উদ্দেশ্যেমুলক ভাবে জলিলকে অত্র মামলায় জড়িত করেছেন, আসামী জলিল নির্দোষ কিন্তু এই সাক্ষী উক্ত সাজেশান অস্বীকার করেছেন।

পি.ডব্লিউ-২১ মোঃ আঃ আউয়াল হাওলাদার তার জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি ২৪/০৮/২০০৩ ইং তারিখে পাথরঘাটায় উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মরত থাকাকালে এই মামলার ঘটনা সংক্রান্তে তার নিকট পিয়ারা বেগম, নাজমা আক্তার, নয়া মিয়া, সোহাগী @ চম্পা, আঃ জলির জবানবন্দি করে। তিনি তাদের জবানবন্দি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মোতাবেক পৃথক পৃথক কাগজে পৃথক সময়ে এবং পৃথক তারিখে লিপিবদ্ধ করেন। তারিখ যথাক্রমে ২৪/০৮/২০০৩ এবং ০৪/০৯/২০০৩ ইং। আসামীরা স্বাভাবিকভাবে জবানবন্দি প্রদান করে যা তার (পি. ডব্লিউ-২১) বিবেচনায় স্বেচ্ছায় ও

স্বাভাবিক বলে প্রতীয়মান হয়। এই সাক্ষী উক্ত জবানবন্দিসমূহ এবং এতে তার স্বাক্ষর সনাক্ত করেন যা যথাক্রমে প্রদর্শনী- ৮, ৮/১, ৮/৩, ৯,৯/১-৯/৩, ১০, ১০/১-১০/৩, ১১, ১১/১-১১/২, ১২, ১২/১-১২/৩ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে।

আসামী নাজমা, পিয়ারা, ও নয়া মিয়ার পক্ষে জেরায় এই সাক্ষী বলেন যে, তিনি সাদা কাগজে ১৬৪ ধারার জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন, Prescribed form তখন ছিল না। আসামীদের ও সাক্ষীদের কখন তার কাছে নিয়ে এসেছে, কখন জবানবন্দি নেয়া শুরু করেছেন এবং কখন তার কাছ থেকে পুলিশ নিয়ে গেছে তা সাদা কাগজে লেখা নাই। তিনি আসামীদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন তবে কাগজে লেখা নেই।

এই সাক্ষীকে এই মর্মে সাজেশান দেয়া হয় যে, তিনি আসামীদের ভাবার (চিন্তা ভাবনা করা) বক্তব্য লেখেননি, আসামীরা তার নিকট স্বেচ্ছায় বক্তব্য দেয়নি, আসামীরা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনে ভীত হয়ে তার নিকট জবানবন্দি করেছে, তিনি ১৬৪ ধারার কোন বিধান পালন না করে জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেছেন কিন্তু এই সাক্ষী উক্ত সাজেশান অস্বীকার করেছেন।

আসামী আবদুল জলিলের পক্ষে এই সাক্ষীকে এই মর্মে সাজেশান দেয়া হয় যে, তার (পি. ডব্লিউ-২১) নিকট কথিত ঘটনার সময় ঢাকায় ছিল মর্মে আসামী জলিল বলেছে বা আসামী জলিল নির্যাতনের ফলে জবানবন্দি করেছে কিন্তু এই সাক্ষী উক্ত সাজেশান অস্বীকার করেন।

এক্ষনে প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষীদের উপরে বর্ণিত সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য হত্যাকান্ডটির কোন প্রত্যদর্শী সাক্ষী নাই। প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষ্য দৃষ্টে ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য মামলার উদ্ধারকৃত লাশটি দন্ডপ্রাপ্ত আসামী আব্দুল জলিলের স্ত্রী ভিকটিম মালতি বেগমের যিনি ঘটনার সময় ঘটনাস্থল বরগুনা জেলার পাথরঘাটা থানাধীন শিংড়াবুনিয়া বাইনচুটকি গ্রামে স্বামী আব্দুল জলিলের বসতবাড়ীতে

বসবাস করছিলেন। ইহাও স্বীকৃত যে, ভিকটিম মালতি বেগমের লাশ বস্তাবন্দি এবং মাটি চাপা দেওয়া অবস্থায় ছিল, যা গত ২৩/০৮/২০০৩ তারিখে ঘটনাস্থল থেকে সুরতহাল প্রতিবেদনে (প্রদর্শনী-২) বর্ণিত সাক্ষী আলী আকবর মন্নান, মিলন, আব্দুর রব মিয়া, সেলিম, মোঃ আলী, মোঃ হিরু গোলদার (পি. ডব্লিউ-২), খালেক, মোঃ রুস্তুম আলী (পি. ডব্লিউ-১৩), মাহাদী হাং, ইকবাল মিয়া, আব্দুল জব্বার হাওলাদার এদের উপস্থিতিতে উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়।

সুরতহাল প্রতিবেদনের প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো:

‘‘অদ্য ২৩/০৮/২০০৩ ইং তাং ১২.৩০ মি: সময় নিহত মালতী বেগম এর লাশ তার শ্বশুর নয়া মিয়া, ননদ নাজমা বেগম, শাশুড়ী পেয়ারা বেগম কর্তৃক সনাক্ত মতে সুরতহাল রিপোর্ট তৈরী শুরু করিলাম। মৃত দেহটি একটি পাটের তৈরী চটের বস্তা আড়া আড়ি ভাবে কাটিয়া বাহির করা হয়। মৃত দেহটি কোমর থেকে উপরের অংশ, নীচের অংশের সহিত সংযুক্ত কিন্তু হাত পা বাকা করিয়া বস্তার মধ্যে ঢুকানো ছিল। ইহাতে লাশের পরিধি অনুমান ৩ ফুট ৬ ইঞ্চি হইবে। মৃতার মাথায় অনুমান ৩ ফুট লম্বা কালো চুল। নাকটি বাকা হওয়া, চোখ দুটি ভিতরের দিকে ঢুকিয়া গিয়াছে। তাহার গায়ের আবরন চামড়া পচিয়া গেলেও গায়ের রং ফর্সা বলিয়া মনে হয়। ডান হাত খানা ভাজ করা, বাম হাত খানা দুই পায়ের নিচে দিয়ে লম্বালম্বি ভাবে আছে। ডান পা খানা ভাজ করা বুকের সাথে মেশানো, বাম পা খানা অর্ধ ভাজ অবস্থায় গোড়ালি মলধারের নিকট আছে। মলধারের পচন অনুভব হয়। পেট ফুলা দেখা যায়। মৃত দেহের গলার সম্মুখ ভাগ দিয়া কোন ধারালো অস্ত্র দ্বারা জবাই করিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহা ছাড়া উল্লিখিত লাশ গর্ত থেকে উত্তোলনকারীদের দ্বারা উলট পালট করিয়া দেখিলাম, কিন্তু লাশের আবরন চামড়া পচিয়া যাওয়ার কারনে অন্য কোন আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়নি। মৃতার পরনে একটি পেটিকোর্ট

আছে, যাহা খয়েরি রং বলিয়া মনে হয়। ইহা ছাড়া তার শরীরের সহিত অন্য কোন কাপড় নাই।”

ভিকটিমের মৃত্যুর কারন সম্পর্কে উক্ত সুরতহাল প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, “নিহত মালতী বেগম এর মৃত্যু সম্পর্কে স্থানীয়ভাবে প্রাথমিক গোপন ও প্রকাশ্য তদন্তে জানা যায় যে, তার স্বামী আঃ জলিল কতিপয় সহযোগীদের নিয়া তাদের দাম্পত্য জীবনে বিরোধের কারনে উক্ত জলিল তাদের সহযোগীদের নিয়া হত্যা করিয়া বাড়ী থেকে অনুমান ৫/৬ শত গজ পূর্ব/ দক্ষিনে প্রাপ্তি স্থলে মাটির নীচে গর্ত করিয়া পুতিয়া রাখে। অতএব নিহত মালতী বেগম এর মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্নয় করার জন্য স্কট পার্টির মাধ্যমে লাশ ময়না তদন্তের জন্য আর, এম, ও সদর হাসপাতাল, বরগুনার মাধ্যমে বরগুনা মর্গে প্রেরণ করিলাম।”

উক্ত লাশের ময়না তদন্ত প্রতিবেদনে (প্রদর্শনী-১৩) উল্লেখ করা হয়েছে যে,

> “One cut throat wound cutting from cervical muscle of the neck round the whole throat cutting all the skin, trachea, esophagus upto the cervical vertibra bone with cutting cervical vertibra bone.
>
> On Deep Disscetion:- Cut throat Wound Cutting all the stracture of the throat.”

মৃত্যুর কারন সম্পর্কে মতামত নিম্নরুপ:

> "In our opinion the death was due to massive haemorrhage & shock as a result of above mentioned injury which was antemortem & homicidal in nature."

উপরে বর্ণিত সুরতহাল প্রতিবেদন (প্রদর্শনী-২) ও ময়না তদন্ত (প্রদর্শনী-১৩) প্রতিবেদন সহ প্রসিকিউশন পক্ষের পি. ডব্লিউ-২, পি. ডব্লিউ-৩, পি. ডব্লিউ-৫, পি. ডব্লিউ-৯, পি. ডব্লিউ-১৩, পি. ডব্লিউ-১৫, পি. ডব্লিউ-২০-দের সাক্ষ্য একত্রে পর্যালোচনায় ইহা সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয় যে, ঘটনাস্থলে মাটি চাপা দেয়া থেকে উদ্ধারকৃত লাশটি দন্ডপ্রাপ্ত আসামী আবদুল জলিলের স্ত্রী ডিসিষ্ট মালতি বেগমের লাশ এবং তাকে গলা কেটে হত্যা করে লাশটি বস্তাবন্দি করে মাটি চাপা দিয়ে ঘটনাস্থলে রাখা হয়েছিল।

এক্ষনে দেখা যাক, উক্ত ডিসিস্ট মালতি বেগমকে কে বা কারা হত্যা করেছে। ইহা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আলোচ্য হত্যাকান্ডের কোন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী নাই। এই মামলায় ০৪ জন আসামী যথা-পিয়ারা বেগম, নাজমা বেগম, নয়া মিয়া, আবদুল জলিল অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছেন, যা বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আঃ আউয়াল হাওলাদার (পি. ডব্লিউ-২১) ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করেছেন।

উক্ত স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিসমূহ (প্রদর্শনী-৮, ৯, ১০, ১১) পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আসামী পিয়ারা বেগম, আসামী আঃ জলিলকে ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে জবানবন্দি (প্রদর্শনী-৮) প্রদান করেছেন এবং উক্ত হত্যাকান্ডের ঘটনার তিনি (পিয়ারা বেগম) প্রত্যক্ষদর্শী নন, বরং তিনি তার মেয়ে নাজমার কাছ থেকে শুনেছেন। তিনি নিজেকে ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে কোন স্বীকারোক্তি প্রদান করেন নাই।

আসামী নাজমা আক্তার এর স্বীকারোক্তি (প্রদর্শনী-৯) পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ঘটনার দিন এশার নামাজের পরে তিনি (নাজমা বেগম) ঘরের উপর তলায় উঠে শুয়ে পড়েন। কতক্ষন পরে শব্দ শুনতে পেয়ে নিচে তাকিয়ে দেখেন যে, আসামী জলিল ভিকটিম মালতিকে জবাই করছে। সকালে উঠে ঘটনা তার মা (আসামী পিয়ারা বেগম) এবং আব্বাকে (নয়া মিঞা) বলেন। অত্র স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি (প্রদর্শনী-৯) পর্যালোচনায় আরো দেখা যায় যে, আসামী নাজমা আক্তার আলোচ্য হত্যাকান্ডের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে কোন স্বীকারোক্তি প্রদান করেননি। তবে আসামী আব্দুল জলিল উক্ত হত্যাকান্ড সংঘঠন করেছে বলে উল্লেখ করেছেন।

আসামী নয়া মিয়ার অপরাধমূলক স্বীকারোক্তি (প্রদর্শনী-১০) পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ঘটনার পরের দিন তিনি দেখেন যে, আসামী জলিল এবং তার স্ত্রী (ভিকটিম) ঘরে নাই। তার মেয়ে নাজমা (আসামী নাজমা আক্তার) তাকে বলে যে, মালতিকে জলিল জবাই করেছে। উক্ত স্বীকারোক্তি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এই আসামীও নিজেকে উক্ত হত্যাকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত না করে স্বীকারোক্তি প্রদান করেছেন। তবে আসামী আঃ জলিল যে, ভিকটিম মালতিকে জবাই করে হত্যা করেছে তা তার মেয়ে নাজমা আক্তারের কাছে শুনেছেন মর্মে তার স্বীকারোক্তিতে উল্লেখ করেছেন।

আসামী আবদুল জলিল এর স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি (প্রদর্শনী-১১) পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ঘটনার দিন রাত ১১.০০ টার সময় তিনি ডাব (নারিকেল) খাওয়ার কথা বলে তার (জলিল) স্ত্রী (ভিকটিম) মালতিকে ঘর থেকে নিয়ে বের হন। তিনি (জলিল) ভিকটিম মালতিকে জবাই করেন নাই মর্মে দাবী করেছেন। তার স্বীকারোক্তিতে উল্লেখ করেছেন যে, জবাই করেছে আফজাল, খলিল, জিয়া ও সাত্তার, জাফর তাকে বুদ্ধি দিয়েছিল। ঘটনাস্থলে তিনি (জলিল) দাড়িয়ে ছিলেন। ওদের সঙ্গে ১০,০০০ (দশ) হাজার টাকায় চুক্তি করে হত্যা করার জন্য। লাশ কোথায় রেখেছে তা সে জানে না। ঘটনার ১০-

১২ মিনিট পরে বৃষ্টি শুরু হয়। ঐ দিন রাতেই সে কাকচিড়ায় যায় এবং সকালে সুরভী লঞ্চে বরিশাল যায়।

আলোচ্য স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি ০৪ টি (প্রদর্শনী- ৮, ৯, ১০ ও ১১) পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে উহা ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় বর্ণিত অপরাধ স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করার নির্ধারিত ফর্মে লিপিবদ্ধ না করে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট (পি. ডব্লিউ-২১) সাদা কাগজে লিপিবদ্ধ করেন। এই প্রসঙ্গে সংশ্লিস্ট বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট পি. ডব্লিউ-২১ হিসাবে আসামী পক্ষের জেরায় উল্লেখ করেন যে, তিনি সাদা কাগজে ১৬৪ ধারার জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করেন। Prescribed Form তখন ছিল না। আসামীদের ও সাক্ষীদের কখন তার (পি. ডব্লিউ-২১) কাছে নিয়ে এসেছে, কখন জবানবন্দি নেয়া শুরু করেছেন এবং কখন তার কাছ থেকে পুলিশ নিয়ে গেছে, তা সাদা কাগজে লেখা নাই। তিনি আসামীদেরকে সতর্ক করেছেন, তবে কাগজে লেখা নাই।

আসামীদের উপরোক্ত স্বীকারোক্তির (প্রদর্শনী ৮, ৯, ১০ ও ১১) আইনগত কোন মূল্য নাই দাবী করে আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলী উল্লেখ করেন যে, সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ও ৩৬৪ ধারার বিধান অনুসরন না করে উক্ত স্বীকারোক্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করেছেন। এছাড়া বিজ্ঞ কৌশলী আরো দাবী করেন যে, কোন অপরাধমূলক স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করার পূর্বে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ (৩) ধারার বিধান অনুসরন করা বাধ্যতামূলক এবং উক্ত স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করা শেষে উহা যে সঠিক ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত তদমর্মে স্মারক প্রদান করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু অত্র মোকদ্দমার ০৪ জন আসামীর অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি (প্রদর্শনী- ৮, ৯, ১০, ১১) লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে উহা আদৌ অনুসরন করা হয়নি। ফলে উক্ত স্বীকারোক্তি সমূহের কোন আইনগত মুল্য নাই। এই প্রসঙ্গে আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবি ডি. এল. আর

৩৭ পৃষ্টা- ৬৬ এ বর্ণিত জাহেদা বেওয়া এবং অন্যান্য বনাম রাষ্ট্র মামলার নজিরটির প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করেন যা নিম্নরুপ:

> "It is a settled principle of law that the requirement of adherence to the provisions of section 164 (3) Cr. P.C. is not a mere matter of form, but one of substance. Section 164(3) is a mandatory provision of law as has been settled by the Privy Council in the case of Nazir Ahmed Vs. King-Emperor, AIR 1936 (P.C) 253. Construing Ss. 164 and 364 Cr. P.C. together, the Privy Council held that it would be an unnatural construction to hold that any other procedure was permitted than that which was laid down with such minute particularity in the sections themselves. Section 164 Cr. P.C is a section confirming the power of a Magistrate and delimiting them. No doubt a Magistrate acting u/ss. 164 and 364 Cr. P.C. is not acting as a Court, yet he is a Judicial offcier, and both as a matter of construction and good sense where a power is given to do a certain thing in a certain way

the thing must be done in that way or not at all, other methods of performance are necessarily forbidden.”

আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবি তাঁর দাবীর সমর্থনে পুনরায় উপরোক্ত নজিরের প্রাসঙ্গিক অংশ উল্লেখ করেন যা নিম্নরুপ:

“Again the Privy Council has already warned against the possibility of coverign up the incurable defects of an inadmissible confession by examining the Magistrate who recorded the confession. The Privy Council says in the aforecited case of Nazir Ahmed Vs. King Emperor AIR 1936 (P.C.) 253: “It is also to be observed that, if the construction contended for by the Crown by correct, all the precautions and safeguards laid down by Ss. 164 and 364 would be of such trifling value as to be almost idle. Any Magistrate of any rank could depose to a confession made by an accused so long as it was not induced by a threat or promise, without affirmatively satisfying himself that it was made

voluntarily and without showing or reading to the accused any version of what he was supposed to have said or asking for the confession to be vouched by any signature. The range of magisterial confessions would be so enlarged by this process that the provisions of Section 164 would almost inevitably be widely disregarded in the same manner as they were disregarded in the present case." We respectfully agree with the above observations of the Privy Council and hold taht the incurable defects in the confession of the Magistrate who recorded the confession. Such procedure will only enlarge the range of magisterial confessions."

অপরদিকে, বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল দাবী করেন যে, ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ও ৩৬৪ ধারার বিধান অনুসরন করে কোন আসামীর অপরাধমূলক স্বীকারোক্তি কেবলমাত্র সাদা কাগজে লিপিবদ্ধ করার কারনে উহা অগ্রাহ্য হবে না। এই প্রসঙ্গে ৪ এম এল আর (এইচসি) (১৯৯৯) পৃষ্ঠা - ২২৫ এ প্রকাশিত আবুল কালাম মোল্লা বনাম রাষ্ট্র মামলার নজিরটির প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করেন যা নিম্নরুপ:

> “The mere absence of printed form for recording the confessional statement of confessing accused, in our view, can not make the confessional statement of the confessing accused inadmissible in evidence. Since the confessional statement Ext. 4 was recorded after due compliance of law, the mere absence of LTI on a particular sheet (though the L.T.I. is available on every sheet except one) and on the face of mentioning of relevant questions before recroding the confessioan statement informing about the consequence of such confessional statement to the confessing accused we are led to hold that the confessional statement Ext.4 is quite admissible in evidence, since it has been recorded as per requirements of section 164(3) of the Code of Criminal Procedure.”

এই প্রসঙ্গে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪(৩) ধারা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো:

> “164(3) A Magistrate shall, before recordign any such confession, explain to the person

making it that he is not bound to make a confession and that if he does so it may be used as evidence agaisnt him and no Magistrate shall record any such confession unless, upon questioning the person making it, he has reason to believe that it was made a memorandum at the foot of such record to the following effect:-

I have explained to (name) that he is not bound to make a confession and that, if he does so, any confession he may make may be used as evidence agaisnt him and I believe that this confession was voluntarily made. It was taken in my presence and hearing and was read over to the prson making it and admitted by him to be correct, and it contains a full and true accound of the statement made by him.

Explanation- It is not necessary that the Magistrate receiving and recording a confession or statement should be a magistrate having jurisdiction in the case."

উপরে বর্ণিত আপীলকারীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি ও বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এর বক্তব্য এবং স্ব স্ব পক্ষে উদ্ধৃত নজিরের প্রাসঙ্গিক অংশ, ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪(৩) ধারার বক্তব্য এবং এই মামলার আসামী পিয়ারা বেগম, নাজমা বেগম, নয়া মিয়া ও আবদুল জলিলের অপরাধমূলক স্বীকারোক্তি (প্রদর্শনী- ৮, ৯, ১০, ১১) এবং উহা লিপিবদ্ধকারী সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট (পি. ডব্লিউ-২১) এর সাক্ষ্য একত্রে পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, লিপিবদ্ধকৃত ৪ টি স্বীকারোক্তি (প্রদর্শনী- ৮, ৯, ১০ ও ১১) সাদা কাগজে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং উহা আদৌ ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ (৩) ধারার বিধান অনুসরন করে লিপিবদ্ধ করা হয়নি, যা বাধ্যতামূলক বিধান। এমনকি, উক্ত স্বীকারোক্তিসমূহ যে সঠিক ও স্বেচ্ছাপ্রনোদিত (true and voluntary) তদমর্মেও কোন স্মারক প্রদান করা হয়নি। ফলে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য মামলায় প্রদত্ত অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিসমূহ ((প্রদর্শনী- ৮, ৯, ১০, ১১) আইন কতৃক স্বীকৃত বিধানসমূহ অনুসরন না করে লিপিবদ্ধ করার কারনে উহার আইনগত কোন মূল্য নেই বিধায় উহা সংশ্লিষ্ট আসামী/ আসামীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার সুযোগ নাই।

ইহা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইহা স্ত্রী হত্যাজনিত মামলা (wife killing case)। ইহাও স্বীকৃত যে, দন্ডপ্রাপ্ত আসামী আঃ জলিলের বসতবাড়ীর সংলগ্ন ঘটনাস্থল থেকে আব্দুল জলিলের স্ত্রী, ভিকটিম মালতি বেগমের জবাই করা বস্তাবন্দি লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রসিকিউশন পক্ষের সাক্ষ্য দৃষ্টে ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য হত্যাকান্ডের পূর্বে দন্ডপ্রাপ্ত আসামী আঃ জলিল এবং তার স্ত্রী ডিসিস্ট মালতি বেগম একত্রে ছিলেন। প্রসিকিউশন কেস দৃষ্টে ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, ঘটনার পরে আসামী আবদুল জলিলকে ঢাকা থেকে পুলিশ গ্রেফতার করে ০৪/০৯/২০০৩ ইং তারিখে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে উপস্থাপন করা হয়। গ্রেফতারের পূর্ব পর্যন্ত আসামী আঃ জলিল তার স্ত্রীর হত্যাকান্ড সম্পর্কিত কোন কারন কোথাও ব্যাখ্য করেনি বরং উক্ত হত্যাকান্ডের পরে

তিনি পলাতক ছিলেন। ফলে দেখা যায় যে, আসামী আঃ জলিল ও ডিসিষ্ট মালতি বেগম পরস্পর স্বামী-স্ত্রী হওয়ায় এবং ঘটনার পূর্বে সর্বশেষ তাদেরকে একত্রে দেখা যাওয়ায় (last seen) উক্ত মালতি বেগমের হত্যার কারন সম্পর্কে সাক্ষ্য আইনের ১০৬ ধারার বিধানমতে স্বামী আব্দুল জলিলকেই উহার ব্যাখ্য প্রদান করতে হবে। এ প্রসঙ্গে সাক্ষ্য আইনের ১০৬ ধারা নিম্নে উদ্ধৃত করা হল:

> "106. Burden of proving fact especially within knowledge- When any fact is especially within the knowldeg of any person, the burden of proving that fact is upon him."

এ প্রসঙ্গে ৬৭ ডিএল আর (এডি) পৃষ্ঠা-৫৪ এ প্রকাশিত মাহাবুব শেখ ওরফে মাহাবুব বনাম রাষ্ট্র মামলার নজিরটির প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা হল যা নিম্নরুপ:

> "It is by now a well established principle that under section 106 of the Evidence Act when any fact is especially within the knowlege of any person the burden of proving that fact is upon him. This Principle has been applied in many cases where the wife has been found killed in the house of the husband where they reside together. In such circumstance the husband will have to prove by positive evidence that he was absent from the house

when his wife was killed or explain by evidence how she came to meet her death."

আলোচ্য মামলাটির ক্ষেত্রে ইহা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দন্ডপ্রাপ্ত আসামী আবদুল জলিল ও ডিসিস্ট মালতি বেগম পরস্পর স্বামী স্ত্রী এবং তাদেরকে ঘটনার পূর্বে আসামী আবদুল জলিলের বসতবাড়ীতে একত্রে দেখা গেছে। আলোচ্য হত্যাকান্ডটির প্রসিকিউশন পক্ষে কোন প্রত্যক্ষদর্শী সার্ক্ষী নেই। ঘটনার পর আসামী আবদুল জলিলকে ঘটনাস্থলে পাওয়া যাই নাই। আসামী আব্দুল জলিল যে ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে ছিলেন না-তা তিনি আদৌ প্রমান করাতে সক্ষম হন নাই। আসামী আবদুল জলিলকে ঢাকায় পুলিশ ধৃত করে গত ০৪/০৯/২০০৩ ইং তারিখে তাকে বরগুনা জেলার পাথরঘাটা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে উপস্থাপন করা হয়। উক্ত হত্যাকান্ডের কোন কারন বা ব্যাখ্য আবদুল জলিল প্রদান করেননি, যা সাক্ষ্য আইনের ১০৬ ধারার বিধানমতে তার (আবদুল জলিল) উপর বর্তায়। ঘটনার পরপরই তিনি (আবদুল জলিল) ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে ঢাকায় অবস্থান করছিলেন। আব্দুল জলিলকে গ্রেফতারের পরে পুলিশ কর্তৃক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি উক্ত হত্যাকান্ডে নিজের সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করেন এবং উক্ত হত্যাকান্ডে ব্যবহৃত দা খানা তার নিজ বসতঘর থেকে মোঃ জাকির হোসেন বাদলের (পি. ডব্লিউ-১)সম্মূখে তিনি (আব্দুল জলিল) নিজ হাতে বের করে দেন এবং উহা জব্দ তালিকামূলে জব্দ করা হয় এবং উক্ত জব্দ তালিকায় পি. ডব্লিউ-১ স্বাক্ষর করেন, যা পি. ডব্লিউ-১ তার জবানবন্দিতে উল্লেখ করেছেন। পি. ডব্লিউ-১ এর উক্ত জবানবন্দির বক্তব্য আসামী জলিলের পক্ষে জেরায় খন্ডন করা হয়নি। এছাড়া, পি. ডব্লিউ-১২ তার জেরায় স্বীকার করেছেন যে, আব্দুল জলিল একটা বাংলা দা নিয়ে ঘটনার দেড় মাস আগে তার (পি. ডব্লিউ-১২) গাড়িতে উঠেছিল এবং বাস ড্রাইভারের সাথে জলিলের ঝগড়া হয়েছিল।

যদিও আসামী আব্দুল জলিল আলোচ্য হত্যাকান্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত করে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট অপরাধামূলক স্বীকারোক্তি প্রদান করেছিলেন, কিন্তু আইনের বিধান যথাযথভাবে অনুসরন করে উক্ত অপরাধমূলক স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ না করার কারনে উহার আইনগত কোন মূল্য নাই মর্মে ইতোপূর্বে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। কিন্তু আসামী আব্দুল জলিল ঘটনার পরে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হয়ে তাদের জিজ্ঞাসাবাদে আলোচ্য হত্যাকান্ডে ব্যবহৃত দা যা নিজের বসতঘরে সংরক্ষন করে রেখেছিলেন, তা সাক্ষীদের উপস্থিতিতে পুলিশের নিকট বের করে দেন এবং উহা জব্দ তালিকামূলে জব্দ করা হয় এবং পি. ডব্লিউ-১ উক্ত জব্দ তালিকার একজন সাক্ষী হিসেবে উক্ত জব্দ তালিকা সনাক্ত করে সাক্ষ্য প্রদান করেন। যদিও আব্দুল জলিলের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি গৃহীত হয়নি। কিন্তু আলোচ্য হত্যাকান্ডে ব্যবহৃত দা খানা আসামী আব্দুল জলিলের দখল ও হেফাজত থেকে তিনি (আব্দুল জলিল) নিজ হাতে বের করে দেওয়ায় এবং ইহা যথাযথ ভাবে জব্দ হওয়ায় সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারার বিধান মতে ইহার সাক্ষ্যগত মূল্য রয়েছে। ফলে এই মামলার শক্তিশালী পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য (strong circumstancial evidence) সহ সামগ্রিক অবস্থা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পরীক্ষা ও পর্যালোচলান্তে ডিসিস্ট মালতি বেগমের হত্যাকারী যে তার স্বামী আবদুল জলিল ইহা সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়েছে।

বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত আসামী আঃ জলিলকে দন্ডবিধির ৩০২ ধারার অপরাধে যে দোষী সাব্যস্ত করেছেন, তা সঠিক ও আইনানুগ। তবে উক্ত আসামীকে দন্ডবিধির ২০১ ধারায় দোষী সাব্যস্থ করা আইনগত ভাবে সঠিক হয়নি বিধায় উক্ত আসামী আবদুল জলিলকে দন্ডবিধির ২০১ ধারায় দোষী সাব্যস্থ করে ০৭ বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং ২০(বিশ) হাজার টাকা অর্থদন্ডের আদেশ রদ ও রহিত করা হল।

আপীলকারী পক্ষের বিজ্ঞ কৌশুলী যুক্তিতর্ক শুনানীকালে আসামী আবদুল জলিলকে নির্দোষ দাবী করে বেকসুর খালাসের প্রার্থনা করেন এবং বিকল্প প্রার্থনায় উল্লেখ করেন যে, যদি দন্ডপ্রাপ্ত আসামী আবদুল জলিলের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩০২ ধারার অপরাধ প্রমানিত হয়, সেক্ষেত্রে আসামীর ইতোপূর্বের কারাবাস সহ নির্জন কারাবাসের (Condemned Cell) মেয়াদ বিবেচনা করে মৃত্যুদন্ডের পরিবর্তে তাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের প্রার্থনা করেন এবং উক্ত দাবীর সমর্থনে ২০ বিএলডি (এইচসিডি) পৃষ্ঠা-৪৫ এবং ৬৬ ডিএলআর (এডি) পৃষ্ঠা-১৯৯ এ প্রকাশিত নজিরসমূহ উদ্ধৃত করেন।

২০ বিএলডি (এইচসিডি) ২০০০, ৪৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত রাষ্ট্র বনাম বেল্লাল হোসেন মামলার নজিরের প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল:-

> "As to the sentence, in a case u/s. 302 of the Penal Code, law has been amended in India as per Act 2 of 1974 and normal sentence for murder is no longer death in India. In Bangladesh there has been no amendment as yet. But after the decision in the case of Nausher Ali Sarder Vs. The state 39 DLR(AD) 194, the sentence has been left to the discretion of the Court to be awarded in consideration of the facts and circumstances of the each case. In the Instant case the accused was arrested on 11.12.91, convicted

and sentence to death on 20.09.1994. He has suffered the agony of death sentence for more than 5 yearss. His has an old mother, one wife (1st wife) and two children to support and look after. He is not a hardended criminal. He found his wife, the deceased, in illicit connection and in an inapropriate situation with Delowar inside a bamboo clump at night and thus suffered from a sense of being wronged by her. He can not be termed as "vicious macho Male"

"None of the above circumstances taken singly and judged rigidly by the old Draconian standards would be sufficient to justify the imposition of the lesser penalty, nor are these circumstances adequate enough to pilliat the offence of murder. But in their totality they till the judicial scales in favour of life rather than putting it out" Therefore, we are inclined to reduce the sencte of death to one of imprisonment for life."

এই প্রসংগে ৬৬ ডিএলআর (এডি) পৃষ্ঠা-১৯৯ এ প্রকাশিত নজরুল ইসলাম বনাম রাষ্ট্র মামলার নজিরের প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল:

> "Lastly, with regard to the period of time spent by the accused in the condemned cell, there are numerous decisions of this Division which shed light on this aspect. In general terms, it may by stated that the lenght of period spent by a convict in the condemned cell is not necessarily a ground for commutation of the sentence of death. However, where the period spent in the condemned cell is not due to any fault of the convict and where the period spent there is inordinately long, it may be considered as an extenuating ground sufficient for commutation of sentence of death."

আলোচ্য মামলাটির মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামী আব্দুল জলিল পুলিশ কর্তৃক ধৃত হয়ে গত ০৪/০৯/২০০৩ তারিখে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর অপরাধ স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করলে, তাকে ঐদিনই জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়। অত:পর মামলাটির বিচার কার্যক্রম শেষ হলে ০৯/০৫/২০১৭ তারিখে তাকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা হলে উক্ত তারিখের পর থেকে জেল কোডের বিধান অনুযায়ী মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত আসামীর জন্য

নির্ধারিত জেল খানার নির্জন কক্ষে (condemned cell) তিনি অবস্থান করছেন। ইতোমধ্যে তার হাজতবাস সহ কারাবাসের সময়সীমা প্রায় ২০ বছরের উর্ধকাল অতিক্রান্ত হয়েছে। দন্ডপ্রাপ্ত আসামীর একটি পুত্র সন্তান রয়েছে। এমতাবস্থায়, সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনান্তে আসামী আবদুল জলিলকে মৃত্যুদন্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা হলে ন্যায় বিচার নিশ্চিত হবে বলে আমরা মনে করি।

সুতরাং আদেশ হয় যে,

অত্র ডেথ রেফারেন্সটি খারিজ করা হল, একই সঙ্গে ক্রিমিনাল আপীল নং ৫৬৫১/২০১৭ এবং জেল আপীল নং ২১১/২০১৭ নামঞ্জুর করা হল। আসামী আবদুল জলিলকে বিজ্ঞ বৈচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত মৃত্যুদন্ডের শাস্তি পরিবর্তন করে তাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ৬ (ছয়) মাসের কারাদন্ডে দন্ডিত করা হল।

উল্লেখিত মতে সংশোধনীসহ তর্কিত রায় ও আদেশ বহাল রাখা হল।

রায়ের অনুলিপিসহ সত্বর নিম্ন আদালতের নথি প্রেরণ করা হোক।

বিচারপতি সহিদুল করিম,

আমি একমত।